Radio Serial Script No. 41 – Services Provided by Major Eco-System

নাটকঃ জলদাপাড়ার জঙ্গলে

রচনা
সায়েন্স কমিউনিকেটরস্ ফোরাম- এর পক্ষে
রূপক হোম রায়

চরিত্রায়ন

সুব্রত - রেঞ্জ অফিসার, বয়স ৪০-৪৫
কনিকা - সুব্রতর স্ত্রী
অয়ন – সুব্রতর ছেলে, নবম শ্রেণীর ছাত্র
রূপম - সুব্রতর বন্ধু, পেশায় শিক্ষক, বয়স ৪০-৪৫
মণিদীপা – রূপমের স্ত্রী
ঐশিকা – রূপমের মেয়ে, অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী
বুধন – সুব্রতর রাঁধুনী, বয়স ৩০
রমেশ – ফরেস্ট গার্ড, বয়স ৩৫
অরুন – ২ নং সিসামারা বীট অফিসার, বয়স ৪০
জামাল – ৪ নং ডায়ানা বীট অফিসার, বয়স ৪০

প্রথম দৃশ্য

(বিকেল বেলা। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান। রেঞ্জ অফিসারের বাংলো। বাংলোর একতলাতে অফিস, দোতলাতে রেঞ্জারের কোয়ার্টার। শুরুতে জিপগাড়ী চলার শব্দ, পাখীর কিচিরমিচির, গাড়ী থামার শব্দ। গাড়ী থেকে নেমে রূপম বাংলোর কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠছে)

সুব্রত – আরে আয়, আয়। রাস্তায় তোদের কোন অসুবিধে হয় নি তো? (মণিদীপাকে) আসুন ম্যাডাম।

রূপম – না, না, অসুবিধে কি হবে? আলিপুরদুয়ার থেকে বাসে তোর অরন্যরাজ্যের সিংহদুয়ার। তারপর তোর পাঠানো বাহনে বাংলোর দোরগোড়ায়। দারুণ লাগলো।

ঐশিকা – অয়নদা তোমাদের জায়গাটা কী সুন্দর! চারদিকে জঙ্গল। এতো পাখী। আমাদের কোলকাতা বিচ্ছিরি। আমাকে কিন্তু গন্ডার দেখাতে হবে।

কনিকা – মণিদি, দাঁড়িয়ে কেন? উঠে এস।

মণিদীপা – আসলে এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না, জলদাপাড়ায় এসেছি। কবে থেকে বলছি একবার জলদাপাড়া চলো। সুব্রতদা কতবার বলেছেন। তা তোমার রূপমদার সময়ই হয় না।

কনিকা – অয়ন তো যেদিন থেকে শুনেছে তোমরা আসছো, সেদিন থেকে পাগল করে দিচ্ছে।

ঐশিকা – অয়নদা তোমার স্কুল ছুটি তো?

অয়ন – হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন তো এক্সমাসের ছুটি। ছুটি না থাকলে স্পেশাল পারমিশন করাতাম।

ঐশিকা – থাঙ্কু অয়নদা। এ ক'দিন আমরা শুধু জঙ্গলে ঘুরে বেড়াব।

সুব্রত – ঠিক আছে, ঠিক আছে। সব হবে। আগে ভেতরে এসো সবাই। মুখ হাত-পা ধুয়ে নাও। বুধন ওদের ব্যাগ-ট্যাগগুলো ঘরে নিয়ে যা।

কনিকা – বুধন ওগুলো গেস্ট রুমে রেখে চা বানাও।

বুধন – জী মেমসাব।

(দৃশ্যান্তর)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(বসবার ঘরে সুব্রত বসে। রূপম জামাকাপড় পালটে ঘরে ঢুকেছে)

রূপম – জানিস সুব্রত কলেজ থেকে একবার এন সি সি ক্যাম্পে হাসিমারা এসেছিলাম। আজ কুড়ি বছর পরে এই আসা। তখন তো চারদিক ঘুরে দেখতে পারিনি। ক্যাম্প থেকে বেরুবারই অর্ডার ছিল না। এবার কিন্তু কোন কিছু বাদ দেব না!

সুব্রত – (হাসতে হাসতে) তুইও দেখি তোর মেয়ের মতো বলছিস। ঠিক আছে। সব হবে। আগে চা খাবার খেয়ে নে। কনি নিজে চপ বানিয়েছে। কেমন হয়েছে বল?

রূপম – (খেতে খেতে) ওঃ দারুণ, তা ম্যাডাম গেলেন কোথায়?

কনিকা – (কিচেন থেকে) আপনারা শুরু করুন, আমরা আসছি।

রূপম – (অবাক হয়ে) আমরা? (হেসে) ওঃ মণি-কনি বড়া ভাজে! (সুব্রত হেসে উঠল)। তা তোর এই বাংলো থেকে মেইন রোড কতটা?

সুব্রত – প্রায় তিন কিলোমিটার। কেন বলতো?

রূপম – আসবার সময় রাস্তায় কয়েকটা ময়ূর দেখতে পেলাম। সাথে অসংখ্য পাখীর কিচির মিচির।

সুব্রত – জঙ্গল থাকলে তো পাখী থাকবেই ব্রাদার। প্রায় দু'শ চল্লিশ রকমের পাখী এই অভয়ারণ্যে বাস করে। তবে নির্ভয়ে বাস করে বলা যাবে না।

রূপম – (চায়ে চুমুক দিতে দিতে) কেন? একথা বলছিস কেন?

সুব্রত – দ্যাখ, গাছই বল আর প্রানীই বল, যে যত সুন্দর তার তত বেশি বিপদ। এই যে ধর ময়ূর। আমাদের জাতীয় পাখী বলে তো শিকারীরা স্যালুট করে না। ময়ূর কেন, বাঘ, হাতি, গন্ডার এদেরকেই ছাড়ে না তো পাখী। বিক্রি করে পয়সা পেলেই হোল।

রূপম – সেই জন্য তোরা আছিস। দেরাদুন থেকে ট্রেনিং নিয়ে এলি। সেগুলো কোনও কাজে লাগছে না?

সুব্রত – লাগবে না কেন? তবে থিয়োরি আর প্র্যাকটিসের মাঝে ফাঁক আছে ব্রাদার। (হঠাৎ দূর থেকে অনেক লোকের হই হই শুনে) এক মিনিট। বুধন, এই বুধন। ভাই কাঁহা দেখো। কনি, কনি শুনছো, অয়ন ঐশিকা কোথায়?

(কনিকার কণ্ঠস্বর শোনা যাবে – ওরা ঐ যে পেছনের বারান্দায় গল্প করছে)

সুব্রত – (উঁচু স্বরে) ঠিক আছে। (স্বাভাবিক ভাবে) দিন কয় আগে একটা লেপার্ডের ঘোরাঘুরি দেখেছে অনেকে। একটু এলার্ট থাকা এই আর কি। যা বলছিলাম, প্রথম যখন এলাম, তখন এই জঙ্গলের কিছুই জানতাম না। এখনো সব জানি তা বলব না। পুঁথিগত বিদ্যে নিয়ে কয়েকটা মাস লেগে গেল জঙ্গলটাকে চিনতে। আর ভাই জঙ্গল মানে তো শুধু গাছপালা, পশুপাখী নয় – এখানকার মানুষ, এখানকার রাস্তাঘাট, নদীনালা সব কিছু।

রূপম – লোকজন? সে তো জঙ্গলের ভেতরে নয়, বাইরে।

সুব্রত – তোর মাথা। বাইশটা বস্তি আছে এখানে। রাজবংশী আছে। কোনটা নেপালী, কোনটা রাভা, মেচ, ভুটিয়া – কত বলব? অবশ্য সবই কোর এরিয়ার বাইরে।

রূপম – কোর এরিয়া? যেখানে পশুপাখী নিরুপদ্রবে বাস কোরতে পারে, বংশবৃদ্ধি কোরতে পারে। যেখানে সবার প্রবেশ নিষেধ?

সুব্রত – ঠিক বলেছিস। তুই তো আবার মাস্টারমশাই, তুই তো জানবিই। যা হোক, যা বলছিলাম, এই লোকগুলোর জীবিকা নির্ভর করে এই জঙ্গলের উপর।

রূপম – মানে ঠিক বুঝলাম না রে?

সুব্রত – কিছু চাষের জমি, এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে, কিন্তু তাতে ওদের সারা বছরের খাবারের চাহিদা মেতে না। ঠিক তখনই কেউ কেউ চোরাশিকারীর খপ্পরে পড়ে।

রূপম – তা তোরাও তো ওদের কিছু কাজ দিতে পারিস। পারিস না?

সুব্রত – দিই তো। আমরা যেসব কাজ করি, যেমন রাস্তা বানানো, নতুন গাছ লাগানো, ঘাস কাটা। এসব কাজে এদেরকেই কাজে লাগাই। কিন্তু সব সমস্যা তাতেও মেটে না।

(বুধন আসবে ভেতরে)

বুধুন – সাব, সিসামারা বীট বাবু এসেছেন। খুব দরকার।

সুব্রত – এখন? আসতে বল। (বীট অফিসার অরুন ঢুকবেন) কী খবর অরুন?

অরুন – স্যার ন'নম্বর চেক পোস্টে তোর্ষার পাড়ে চারজনকে স্পট করেছি। প্রত্যেকে আর্মড স্যার। ওখানে কাল থেকে একটা হাতির পাল আছে। দলে দুটো দাঁতাল।

সুব্রত – তোমার সাথে গার্ড ক'জন? কি আর্মস আছে?

অরুন – আমি আরও দু'জন। রাইফেল আমার নিয়ে দুটো।

সুব্রত – বুধন, অফিস থেকে সার্চ লাইট আর মেডিক্যাল বক্স গাড়ীতে দে। অরুন তুমি ড্রাইভারকে তেল চেক করে গাড়ীতে যাও। আমি আসছি।

(সুব্রত ভেতরের ঘরে গেল। ভিতর থেকে কনিকা ও মণিদীপার কথা ভেসে আসবে। সিঁড়িতে অরুন ও বুধনের তাড়াতাড়ি নেবে যাবার শব্দ। দ্রুত আবহসঙ্গীত। সুব্রত, কনিকা ও মণিদীপার ঘর থেকে বার হয়ে এল। অয়ন ঐশিকাও এসে দাঁড়াবে)

সুব্রত – রূপম, সরি, আমাকে একটু বেরুতে হচ্ছে। সব ঠিকঠাক থাকলে ফিরে একসাথে ডিনার করবো। কাল সকালে জঙ্গলে বেড়াতেও নিয়ে যাব। বাট, ডোন্ট গেট প্যানিকি নাউ।

রূপম – রাইফেল হাতে দলবল নিয়ে বেরুচ্ছিস। আর আমাকে বলছিস, ডোন্ট গেট প্যানিকি।

সুব্রত – আরে পার্ট অফ আওয়ার লাইফ। এসে বলব সব।

কনিকা – অয়ন, ওই দুটো ওয়াটার বটল গাড়ীতে দে।

সুব্রত – থ্যাংক য়ু কনি। অয়ন, আমাকে দাও ওই দুটো। আমি আসছি।

মণিদীপা – দুগ্গা, দুগ্গা।

(দৃশ্যান্তর)

তৃতীয় দৃশ্য

(জীপগাড়ির স্টার্ট দেওয়ার শব্দ। ওয়াকিটকিতে কথোপকথন একটু নীচু স্বরে। উপযুক্ত আবহসঙ্গীত)

সুব্রত – হ্যালো বীট তিন, বীট থ্রি, হ্যালো, হ্যালো।

৩নং বীট – হ্যালো, ইয়েস স্যার বীট থ্রি বলছি।

সুব্রত – বীট থ্রি – বীট টু সিসামারা বলছি, নয় নম্বর চেক পোস্ট, তোর্ষা পাড় - ফোর্স নিয়ে আসুন।

৩নং বীট – ওকে, মুভিং স্যার।

সুব্রত – হ্যালো বীট ফোর - হ্যালো ডায়না। হ্যালো। শুনতে পারছেন। কে বলছ।

জামাল – হ্যালো, হ্যালো জামাল বলছি স্যার।

সুব্রত – হ্যালো জামাল। জামান শুনতে পাচ্ছ? তোর্ষা পাড়। পোস্ট নাইন। আর্মস গার্ড নিয়ে। কুইক।

জামাল – ওকে, আসছি স্যার।

সুব্রত – অরুণ, সব চেক পোষ্টকে এলার্ট করো।

(রাতের জঙ্গলে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে আর জিপের শব্দ। নিচু স্বরে ওয়াকিটকিতে কথা শোনা যাচ্ছে।)

সুব্রত – হ্যালো-হ্যালো-ডিএফও-টু। রেঞ্জ জিরো ওয়ান-রেঞ্জ জিরো ওয়ান কলিং। সুব্রত বলছি স্যার। লোকেশন বীট টু। হ্যালো – ইয়েস স্যার। অল এলারটেড। টাইম লগড। ওভার।

(হঠাৎ দূরে একটা গুলির শব্দ। হাতির আর্তনাদ)

সুব্রত – ওঃ। হেরে গেলাম মনে হচ্ছে অরুন। পুট আউট দা লাইট। সার্চ লাইট অফ করে দাও। শব্দটা কোন দিক থেকে এলো?

অরুন – ঐ দিক থেকে স্যার।

সুব্রত – চল নামি - ফলো মি ইন লাইন। তুমি ডান দিক কভার করো - গার্ড বাঁ দিক - আমি ফ্রন্ট। সাবধান। মুভ।

(ঝোপঝাড় সড়িয়ে হাঁটার শব্দ। দূরে একটা করাত দিয়ে কিছু কাটার ঘ্যাঁস ঘ্যাঁসশব্দ। শব্দটা আস্তে আস্তে বাড়বে)

অরুন – (ফিসফিস করে) স্যার, আপনার আমার মাঝখানে সোজা। দুটো, মনে হচ্ছে, শিরীষ গাছের নীচে। দেখেছেন?

সুব্রত – (ফিসফিস করে) স্পটেড। লাইট। (চীৎকার করে) হ্যান্ডস আপ। নেহি তো গোলী চলেগা।

(ঝোপঝাড় ভেঙ্গে দৌড়নোর শব্দ। চিৎকার, চেঁচামেচি। সুব্রত অর্ডার দিচ্ছে, ফায়ার। জামাল, ফায়ার। অনেকগুলি গুলির শব্দ। দৌড়ে পালাবার শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে)

সুব্রত – (জামালকে দেখতে পেয়ে) জামাল রান, রান। অরুন, আমরা জামালকে কভার করছি।

(ঝোপঝাড় ভেঙ্গে দৌড়নোর শব্দ।)

জামাল – (হাঁপাতে হাঁপাতে আসবে) পারলাম না স্যার। তোর্ষা। ভটভটি করে পার হয়ে গেল। আমার বন্দুকের রেঞ্জের বাইরে স্যার।

সুব্রত – অরুন, কল মাদারিহাট, জয়ন্তী, বক্সার। বেশিদূর যেতে পারবে না। চলো, স্পটে যাই।

(দৃশ্যান্তর)

চতুর্থ দৃশ্য

(সুব্রতর বাংলো। বুধন ও কনিকা রান্নাঘরে। রুপম, মণিদীপা, অয়ন, ঐশিকা ড্রয়িংরুমে। বাইরে শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে)

রুপম – কী অপরুপ দৃশ্য বাইরে। চারদিক জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। অসংখ্য জোনাকির আলো আর ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক সব কিছু মায়াবী করে তুলেছে।

মণিদীপা – আমার সুব্রতদার জন্য চিন্তা হচ্ছে। (একটু স্বর তুলে) কনিদি তোমার ভয় করছে না।

কনিকা – (রান্নাঘর থেকেই) করছে না তা না, তবে খানিকটা তো গা সওয়া হয়ে গেছে - হয়ে যায়, তাই না।

(মাঝে মাঝে দূরে ময়ূরের ডাক শোনা যাচ্ছে)

অয়ন - কাকীমা আমার কিন্তু ভয় করছে না।

ঐশিকা – কেন কেন? ঐ ক্যা ক্যা ডাকটা শুনলেই ভয় করছে আমার।

অয়ন – ভয় করছে না কারণ বাবার হাতে রাইফেল থাকলে – (ঐশিকাকে) ভয় পাস না। ওটা খুউব সুন্দর একটা পাখীর ডাক। ময়ূর ডাকছে।

রুপম – ডাকটা অবশ্য আমার চেনা। অয়ন এখানে বাঘ আছে?

অয়ন – আছে কাকু। চিতা বাঘ। শুনেছি আমি যখন খুব ছোট তখন বাবা দুটো মা-মরা চিতার বাচ্চা নিয়ে এসে পুষেছিল।

ঐশিকা – আরে ব্বাস! কোথায় তারা?

বুধন – (চা নিয়ে এসেছে) মেমসাব বললেন কি একটু চা দিয়ে আয়।

রুপম – আমাকে সুব্রত লিখেছিল। একটু বড় হতে মাদারীহাট রেস্কিউ সেন্টারে দিয়ে এসেছে। ওখানে জঙ্গলের ধরা পড়া আহত পশুকে রেখে চিকিৎসা করা হয় জানতাম। সুস্থ হলে আবার জঙ্গলে ছেড়ে দেয়।

মণিদীপা – আমি যাই কনিদিকে একটু সাহায্য করি।

রূপম – বুধন, তোমার বাড়ি কোথায়?
বুধন – জয়ন্তী বাবু।
রূপম – বাড়িতে কে কে আছেন?
বুধন – বাবা, মা, দুভাই। এক বোন।
রূপম – কী করেন তোমার বাবা?
বুধন – জঙ্গল থেকে কাঠ, পাতা নিয়ে আসে। মজুর খাটে।
রূপম – অয়ন, তোমার বাবার কোন ইনফরমেশন?
বুধন – গাড়ীতে ওঠার সময় সাব বললেন দেরি হলে সবাই যেন খেয়ে নেয়।
রূপম – (স্বর উঁচু করে) এই মণি, কনি শুনছ? সুব্রত কি বলে গেছে?
অয়ন – কাকু, টেনশন নেবেন না, বাবার এসব নরম্যাল। সময় হলে আমরা ডিনার করে নেব।

(একটা তক্ষক ডেকে উঠবে)

ঐশিকা – এই অয়নদা এটা আবার কিসের ডাক?
বুধন – ওটা দিদি তক্ষক। রেতে কত রকমের ডাক শুনবেন। হরিণ, পেঁচা, ময়ূর আরও কত কি। ঠিক না দাদা?
অয়ন – কপাল ভালো থাকলে বাঘের হতে অসুবিধে নেই। কোলকাতার মেমসাহেব এসেছে জানে।
ঐশিকা – এই অয়নদা, ভয় দেখাবে না। বাবা –
রূপম – বাঘ জানে এ বাড়িতে রাইফেল আছে। ভয়ে সে-ই আসবে না।

(কনিকা ও মণিদীপা রান্নাঘর থেকে ড্রইংরুমে এসেছে।)

কনিকা – বুধন, তুই যা। ডিনার টেবিল সাজিয়ে ফেল। সিঙ্কের বাসনগুলো ধুয়ে নিয়ে র‍্যাকে তুলবি। স্যালাডগুলো রেডি করে নিস।
মণিদীপা – জানো, টম্যাটো, কাঁচা লঙ্কা, শসা এমন কি লেটুস পাতা পর্যন্ত সব কনিদির কিচেন গার্ডেন থেকে!
রূপম – সেকী সব নিজে হাতে!
কনিকা – আরে না না, বুধন হেল্প করে। তাছাড়া কী করে সময় কাটাই বলুন? একজন জঙ্গল জঙ্গল করে কাঠচোর ধরেন আর ইনি স্কুল হলিডেতে বাড়িতে এলেও প্রজেক্ট খাতা, সায়েন্স মডেল নিয়ে ঘরে দরজা দিয়ে বসে থাকেন।
অয়ন – কেন মা ওটা বল? জানেন তো কাকিমা, ফাদার রেকটর মা বাবা দুজনকেই রিকোয়েস্ট করেছিলেন –
কনিকা – তোমাকে আর পাকামো করতে হবে না বাবু –
মণিদীপা – কি, কিরে অয়ন, কি রিকোয়েস্ট করেছিলেন?
অয়ন – ফাদার রেকটর চেয়েছিলেন মা সপ্তাহে জাস্ট একটা করে দিন জিওগ্রাফি পড়ান আমাদের স্কুলে। ফাদার গাড়ীর ব্যবস্থা করবেন বলেছিলেন। মা বাবা আমাকেও দেখে আসতে পারতেন।
রূপম – সুব্রতর কোন আপত্তি ছিল? তোমার একটা এনগেজ থাকার উপায় ছিল!
কনিকা – তা ছিল। আমারই কেমন জানি ইচ্ছে করল না।
মণিদীপা – না করেছে, না করেছে। এত ভালো কিচেন গার্ডেন করতেও তোমার কত সময় যাচ্ছে।
বুধন – (রান্নাঘর থেকে) মেমসাব খাবার দিই?
কনিকা – (সবাইকে) দিয়ে দিক? (স্বর উঁচু করে) দে দিয়ে দে, আমি আসছি।
রূপম – আমরা সবাই কিন্তু একবারে বসে যাব।
মণিদীপা – তোমরা তিনজন বোসো তো। আমি আর কনিদি তোমাদের দিয়েই বসে যাব। একটু সুব্রতদার জন্য না-হয় দেখি।
অয়ন – কিচ্ছু লাভ নেই। বাবা বরং এখন বিরক্ত হয় অপেক্ষা করে দেরী করে খেলে।
রূপম – অগত্যা। চলো সবাই।

(স্বল্প বিরতির আবহসঙ্গীত)

কনিকা – রূপমদা একটা কথা বললে আপনি খুব মজা পাবেন।
রূপম – (খেতে খেতে) মজার কথা বললে মজা পেতেই পারি। তা শুনি কি এমন মজার কথা?
কনিকা – মেনু কিন্তু খুব ছোট। স্যালাড, মাংসের চপ, মুরগীর মাংস আর প্লেন রাইস।
রূপম – তা এতে মজা কিসের?
কনিকা – দেশী মুরগী এবং তা আমাদের নিজেদের পোলট্রির।
রূপম – মা-মা-মানে? নিজেদের পোলট্রির?
অয়ন – মায়ের গাইডেন্সে বুধুন পোলট্রি-কিপার। গোটা তিরিশ আছে। টেবল আর এগ লেয়িং– আলাদা।
রূপম – (স্বর উঁচু করে) জিতে রহো ভাই, তুলনা নাহিরে!
কনিকা – হয়েছে, হয়েছে। এবার থামুন। সব কিন্তু খেয়ে উঠবেন। আরেকটা চপ নিন।
মণিদীপা – জোর করোনা কনিদি। একটা চপও অন্য ডিশে যাবে না কিন্তু।
কনিকা – কিচ্ছু হবে না। মনিদি এবার তুমি বোসো।
মণিদীপা – তুমিও এসো।
ঐশিকা – (হাত ধুতে ধুতে বলছে। জলের শব্দ দিতে পারলে ভালো) আচ্ছা অয়নদা জলদাপাড়া তো গণ্ডারের জন্য বিখ্যাত। তাদের দেখা নাইরে, তাদের দেখা নাই।
অয়ন – (থিয়েটারি ঢঙ্গে) কপাল ভালো থাকিলে কাল প্রভাতেই মোলাকাত হইবে কন্যা। বাংলোর পেছনে নুন খেতে আসবেন দুএকজন।
ঐশিকা – নুন খেতে? তাই কাকীমা?

(স্বল্প বিরতির আবহসঙ্গীত। বারান্দায় রূপম একা। অনেকটা কবিতা আবৃত্তি করবার মতো করে বলবে।)

রূপম – হে জ্যোৎস্নাস্নাত অরণ্য। কী অপার কুহেলিকায় ঘেরা তোমার মুখ! তোমার সৌন্দর্য যুগ যুগ ধরে মানুষকে আকর্ষণ করে চলেছে। তোমার সংসারে কী নেই? পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ সবাইকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ, পৃথিবীকে করেছো সবুজ সুন্দর। তোমাকে জানাই শত কোটি প্রণাম।

(দৃশ্যান্তর)

পঞ্চম দৃশ্য

(ভোরবেলা। সুব্রত ফিরেছে। সবাই ড্রয়িংরুমে।)

রূপম – (চা খেতে খেতে) তা তুই এই শেষ রাতে এসে আবার বেরুবি? একটু রেস্ট নিলে হয় না?
সুব্রত – ততক্ষণ সূর্যদেব তো আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন না। তোরা রেডি তো?
মণিদীপা – রেডি? রাত তিনটে থেকে রেডি হয়ে ঘর-বার করছে আর কবিতা আওড়াচ্ছে!
সুব্রত – তাই? রূপম তো একসময় পদ্য লিখতও।
কণিকা - বুধন চা-বাস্কেট গাড়ীতে দিয়েছিস তো?
বুধন – জী। দিয়েছি। পানির জেরিক্যান দিলাম।
সুব্রত – গুড, তাহলে আমরা এগোই চল। বাবু রাইফেলটা সাথে নিই?
অয়ন – আমি নিচ্ছি। লোড করা নেইতো?
সুব্রত – না, না। সে আমার রুক্স্যাকে।

(অনেকের বেরুবার পায়ের শব্দ।)

সুব্রত – এক মিনিট। (স্বর উঁচু করে) অরুন, রমেশ কে আছো। ওটা নিয়ে এস।

(রমেশ একটা হাতির দাঁত নিয়ে আসবে।)

সুব্রত – রমেশ বারান্দাতে দাঁড়াও। মণিদি, রূপম দেখে নে।
ঐশিকা – আই বাপ! কত্ত বড় দাঁত!আপনার প্রাইজ কাকু?
সুব্রত – না ঐশী, আমার হেরে যাবার প্রমাণ। আমরা বাঁচাতে পারিনি হাতিটাকে।
রূপম - কত বড়? ছফুট হবে?

সুব্রত – ছফুট চার ইঞ্চি। গার্ত (girth) দশ ইঞ্চি। চল এগোই।

(গাড়ী স্টার্ট দেবার শব্দ। একটু পরে গাড়ি থামার শব্দ।)

সুব্রত – (নিম্ন স্বরে) ডানদিকে তাকাও ঐশী। নুন খেতে এসেছে। পরে আরও দেখা যাবে।

রূপম – (নিম্ন স্বরে) আরে একেবারে তিন মূর্তি!

সুব্রত – ইয়েস, আমার মতো ফ্যামিলি নিয়ে বেরিয়েছে।

মণিদীপা – সুব্রতদা, আপনি একটা যা তা।

রূপম – দাঁড়া, দাঁড়া, এক মিনিট। একটা ছবি তুলি।

ঐশিকা – বাবা, আমি দুটো নিয়েছি। আচ্ছা কাকু আপনার কত গণ্ডার আছে?

অয়ন – বাবার একটাও গণ্ডার নেই।

সুব্রত – বাবু, কেন ওকে খ্যাপাচ্ছিস? অফিসিয়ালি আমাদের পুরো জলদাপাড়াতে একশ পঁচাশি। কাজিরাঙ্গার পরেই আমরা।

(আবার গাড়ী স্টার্ট দেবার শব্দ। কথাও শুরু।)

রূপম – কী দারুণ লাগছে! পুব আকাশ লাল হয়ে উঠছে। এতো পাখীর ডাক!

কণিকা – রূপমদা প্রায় আড়াইশ মতো প্রজাতির পাখি আছে এখানে। আমি নিজে ক্যাটালগ করতে পেরেছি দেড়শ মতো।

রূপম – রিয়েলি? সেতো দারুণ কাজ! কীরে সুব্রত আগে তো কখনো বলিসনি!

সুব্রত – কনিই বলতে দেয় নি। বলে আরও কাজ হোক, তারপরে।

কণিকা – ক্রেস্টেড ঈগল, ব্ল্যাক প্যাট্রিজ, হর্ন বিল, বেঙ্গল ফ্লরিক্যানের মত স্পিসিস দেখেছি আমি। ছবিও আছে।

রূপম – বাড়ি ফিরেই দেখব কিন্তু। ঠিক আছে?

ঐশিকা – চারিদিকে এত লম্বা লম্বা ঘাস। এগুলো কাশ কাকু?

সুব্রত – কিছু কাশ অবশ্যই। বেশির ভাগ এলিফ্যান্ট গ্র্যাস। এজন্যই একে গ্র্যাসল্যান্ড ফরেস্ট বলে। এটা গণ্ডারের চারণভূমি।

রূপম – বাই দি বাই, তোর কাল রাতের অভিযানের গল্প তো শোনা হোল না।

সুব্রত – (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) একটা দাঁতালকে মেরে ফেলেছে। আরও আফসোস, আমরা স্পটে পৌঁছোবার আগেই একটা দাঁত কেটেও নিতে পেরেছিল। ওটা নিয়েই পালিয়েছে।

রূপম – ধরতে পারলি না?

সুব্রত – নাঃ তবে পালাতে পারবে না। ট্রেল ট্রেস করে মনে হোল কম করে একজন ইঞ্জিওরড আমাদের গুলিতে। পোষা ডাক্তারের কাছে না গেলে ধরা পড়বেই।

রূপম - পোষা ডাক্তার! মানে টাকাতে পোষা?

সুব্রত – ইয়েস স্যার। টাকা দিয়ে পোষা। টাকার ফাঁদ পাতা ভুবনে, কখন কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে বন্ধু!

রূপম – হাতিটার কি একটাই দাঁত ছিল?

সুব্রত – আরে না! আরেকটা নিয়ে এসেছি। এর জন্যই তো দেরী হোল। ওটাই তো দেখলি।

(গাড়ি থামার শব্দ। কথাও শুরু। পাশেই নদী। কল কল শব্দ শোনা যাবে)

মণিদীপা – আঃ কি শান্তি! এটা নিশ্চয় তোর্ষা?

কণিকা – হ্যাঁ মনিদি, আর দূরের ঐ পাহাড়টা ভুটান পাহাড়।

সুব্রত – জানেন তো জলদাপাড়া এখন আর অভয়ারণ্য নয়। জাতীয় উদ্যান।

রূপম – এর আয়তন কত হবে?

সুব্রত – দুশ ষোল স্কোয়ার কিলোমিটারের মত। চল আমরা এই উঁচু ঢিবিটাতে বসি। একটু পরেই এখানে হাতি আসবে।

রূপম – রোজ হাতি আসে এখানে?

কণিকা – আসে। আর পশুপাখিকে তাদের এই অভ্যেস ভার্নানেবল করে দেয়।
সুব্রত – এগজ্যাক্টলি। কদিন ধরে আসছে। আর সেই সুযোগটাই তো ওরা নিল।
রূপম – এই জঙ্গল এই রাজ্যের সব থেকে বড় ফরেস্ট ইকোসিস্টেম তাই না?
সুব্রত – অবশ্য সুন্দরবন বাদ দিয়ে। ওটাতো ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। তো এদের কাছে আমরা কত ঋণী। অথচ আমরাই এদের ধ্বংস করে চলেছি।
রূপম – তোদের এখানেও?
সুব্রত – না, এটা ন্যাশনাল পার্ক। যে কোন ন্যাশনাল পার্কেই গাছ কাটা সম্পুর্ন নিষিদ্ধ। অবশ্য চোরাকারবারিরা ছাড়া। ওরা পারে কারণ আমরা ফেইল করি।
রূপম – তাহলে বাজারে এত কাঠ আমরা কোথা থেকে পাই?
সুব্রত – কিছু কিছু সংরক্ষিত বা প্রটেক্টেড ফরেস্টে নিয়ম করে গাছ কাটার, গাছ লাগাবার পলিসি ডিসিশন আছে। আবার সেখানেও চোরাশিকারীরা আছে। সেখানেও আমরা ওদের মোকাবেলা করি।
মণিদীপা – একমিনিট সুব্রতদা। আপনাদেরই এক কলিগ অফিসার হবেন। বিজয়া টির্কে। চোরাশিকারীদের সাথে জলপাইগুড়ি না কোথায় যেন লড়ে গিয়েছিলেন। খবরের কাগজে দেখেছি।
সুব্রত – ঠিক। দারুণ স্পিরিটেড মহিলা।
রূপম – ঠিক, গাছ তো শুধু অক্সিজেনই দেয় না, জলও দেয়, মেঘ হতে সাহায্য করে, জলীয় বাস্প ধরে রাখে। মাটির নীচে জল যেতে সাহায্য করে।
সুব্রত – তুই এটা তো মানবি জঙ্গল মানে তো আর শুধু গাছপালা নয়, এদের সাথে আছে অজস্র কীটপতঙ্গ, পশু-পাখি। এরা আমাদের সম্পদ নয়? আর এদের আমরা মেরে ফেলছি।
মণিদীপা – ইসস্, ঐ যে হাতি। সুব্রতদা আপনার কথাই ঠিক। একেবারে সপরিবারে। কনি এটা তোমাদের রূপমদার পরিবার?
কণিকা – এই রে! রূপমদা আমি কিন্তু এই নামাকরনের মধ্যে নেই।
ঐশিকা – কী! তাহলে আমি ঐ বাচ্চা হাতিটার মত? এ মা!
অয়ন – সে আর কি করা যাবে? গণ্ডারের বাচ্চাটা কি আমার মতো ছিল?
সুব্রত – মনে হয় কাল মারা পড়া হাতিটা এই দলের ছিল। কোনভাবে কাল দলছুট হয়ে বেচারা মারা পড়ে গেল। এরা কিছুক্ষণ এখানে থাকবে, জল খাবে, স্নান করবে, তারপর আবার জঙ্গলে ফিরে যাবে।
রূপম – তোর হলং বাংলোর ট্যুরিস্টরা বোধ হয় বেড়িয়ে পড়েছে?
সুব্রত – শুধু হলং কেন রে, মাদারীহাট, বড় ডুবরি থেকেও এখানেই আসবে। তবে তাতে জঙ্গলের আর কতটুকুই বা দেখানো যায় বল? পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগও নয়।
মণিদীপা – আচ্ছা তোর্ষা ছাড়া এখানে আর কোন নদী নেই?
সুব্রত – থাকবে না কেন? মালঙ্গি, হলং, চিরাখাওয়া, কালিঝোরা, সিসামারা, ভালুকা কত নাম বলবো। এরাই তো জলদাপাড়াকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কি এবার চলা যাক না কি?
ঐশিকা – (হতাশার সুরে) বাংলোতে ফিরে কী করবো?
কণিকা – ওমা ব্রেকফাস্ট করতে হবে না! খেয়ে-দেয়ে আবার বেড়ানো যাবে।
মণিদীপা – ওদের এখন খেতে না দিলেও আপত্তি নেই।
রূপম – না, না কণিদি ঠিকই বলেছেন, চলো ফেরা যাক।

(স্বল্প বিরতির আবহসঙ্গীত)

(সুব্রতর বাংলো। গাড়ি থামার শব্দ।)

সুব্রত – তোমরা ওপরে যাও। আমি একটু অফিস হয়ে আসছি।
রূপম – আজ তো রবিবার, আজকেও তোর অফিস আছে?

সুব্রত – ইয়েস স্যার, এটা তোমার স্কুল নয়। কাল সারা রাত যে ক্যান্ডটা হোল তার রিপোর্ট লিখতে হবে না। হাতিটার পোস্টমর্টেম করতে হবে। ডিএফওকে ডিটেলস্ জানাতে হবে। তোরা যা, আমি আসছি।

ঐশিকা – কাকু, তুমি কিন্তু একেবারে দেরী করবে না। ব্রেকফাস্ট করেই আমরা বেরুবো।

কণিকা – বুধন, সব রেডি করেছিস তো?

বুধন – হ্যাঁ, মেমসাব রেডি। আপনারা বসুন। আমি দিচ্ছি।

মণিদীপা – আমি কিন্তু আর বের হচ্ছি না কনিদি।

কণিকা – ওমা! কেন?

মণিদীপা – পেছনের বারান্দাতে চুপচাপ জঙ্গলের দিকে চেয়ে থাকতে যেন বেশি ভালো লাগে গো।

কণিকা – আমারও। তবে এখন। আগে কিন্তু ওঁর সাথে আমিও টো টো করে জঙ্গলে ঘুরেছি।

রূপম – প্রথম প্রথম যখন সে পুরোটাই ছিল অচেনা তখন চেনার কৌতূহল ছিল। আস্তে আস্তে চিনেছ। কৌতূহল মিটেছে। এখন আর টুরিস্টের দেখা নয়। এখন বন্ধুর দেখা। শান্তমনে কথা বলা।

কণিকা – অনেকটাই তাই রূপমদা। আমি এই কারনেই বাবুর স্কুলে পড়াতে রাজি হইনি। বাবু হস্টেলে। ও অফিসে বা ফিল্ডে। বুধন কিচেনে। আমি চুপ করে বারান্দায় বসে থাকি।

(ব্রেকফাস্ট টেবিলে খাওয়া-দাওয়ার শব্দ। স্বল্প বিরতির আবহসঙ্গীত)

রমেশ – (ঘরের বাইরে থেকে) মাইজি। রমেশ আসলাম মাইজি।

কণিকা – বুধন দেখতো কে? বাইরে কে ডাকছে যেন?

বুধন – রমেশদা মেমসাব।

কণিকা – ভেতরে এসো রমেশ। (রমেশ ভেতরে এলো) কি ব্যাপার রমেশ?

রমেশ – মাইজি। সাহেবের দেরি হবে। খুকিকে নিয়ে মাহুত আসল। সাহেব বললেন আপনাদের হরিণডাঙ্গা ঘুরিয়ে আনতে।

মণিদীপা – সেকী! মাহুত পারবে সামলাতে একা?

কণিকা – না না রমেশ থাকবে। ভেবোনা মনিদি। অয়নকে আমরা তো একা একা রমেশ বা মাহুতের সাথেই ছেড়ে দিই। আর খুকি খুব শান্ত হাতি।

ঐশিকা – হাতিতে চড়বো! আঃ গ্র্যান্ড! দারুণ মজা হবে। অয়নদা চল চল।

অয়ন – মা, মানুষ খুকি, হাতি খুকির পিঠে চড়বে! উল্টো হলে?

ঐশিকা – কাকিমা! দেখেছ আবার আমার পেছনে লেগেছে অয়নদা!

রূপম – কনি এন্ড মণি ইউ টু দেন এঞ্জয় ইয়োরসেলভস্। আমরা এগোই।

অয়ন – রমেশকাকু চলো।

(দৃশ্যান্তর)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(হাতির পিঠে রূপম, অয়ন, ঐশিকা, রমেশ ও মাহুত।)

অয়ন – রমেশকাকু প্রথমে গ্রাসল্যান্ডে চলো।

রমেশ – ওখানেই তো যাবা। স্যার বলেছে।

ঐশিকা – গ্রাসল্যান্ড তো আমরা সকালেই দেখলাম। আচ্ছা অয়নদা গ্রাসল্যান্ড মানে কি ঘাস জমি?

অয়ন – ঠিক বলেছিস। আসলে এই জলদাপাড়া একটা গ্রাসল্যান্ড ফরেস্ট। ঐ যে লম্বা লম্বা ঘাস ওগুলোকে বলে এলিফ্যান্ট গ্রাস।

রমেশ – (নিচু স্বরে) খোকাদাদা ডানদিকে হরিণের পাল।

ঐশিকা – (স্বর উত্তেজনাতে উঁচু করেই মুখে হাত চাপা) ওঃ মা। কত্ত হরিণ!

অয়ন – (নিচু স্বরে) এদের নাম জানিস?

ঐশিকা – কি নাম আবার? হরিণ?

অয়ন – দূর! হরিণ অনেক রকম হয়। এদের বলে স্পটেড ডিয়ার। চিতল। গায়ে বুটি বুটি দাগ দেখতে পাচ্ছিস?

রুপম – (বায়নাকুলার চোখে) বায়নাকুলার দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঐশিকা, এই নে এটা দিয়ে দেখ।

ঐশিকা – দারুণ! বাবা, তুমি ছবি তুলছো তো? মাকে দেখাতে হবে।

রমেশ – কপাল ভালো থাকলে দিদি বারকিং ডিয়ারও দেখতে পাবে।

ঐশিকা – অয়নদা, দেখ কত মোষ।

অয়ন – তোর মাথা। ওগুলো বাইসন। একবার তেড়ে এলে আর রক্ষা নেই। তাই না রমেশকাকু?

রমেশ – হ্যাঁ, খোকাদাদা, ঠিক বলেছ। ওরা সাঙ্ঘাতিক জীব।

ঐশিকা – বাবা বায়নাকুলারটা একবার দেবে। ভালো করে দেখতে পাচ্ছিনা।

রুপম – এইনে। ভালো করে দ্যাখ। পায়ের নীচের দিকের লোমগুলো ভালো করে অবজারভ কর। হালকা বাদামি রঙ। মনে হবে যেন পায়ে মোজা পরে আছে।

ঐশিকা – হ্যাঁ বাবা। আরে! দুটো গণ্ডার ওই দিকে।

রমেশ – দাঁড়াও, হাতিটা একটু সামনে যাক। (হুর্রর্, মুখে শব্দ) এবার দেখো দিদি।

অয়ন – বলোতো এদের কি বলে?

ঐশিকা – ওয়ান হর্নড্ রাইনো। একশৃঙ্গ গণ্ডার। আরেক রকম গণ্ডার আছে। আফ্রিকায়। তাদের দুটো করে খড়্গ থাকে। এখানে অনেক গণ্ডার আছে তাই না?

অয়ন – তখন বললাম যে। অনেকে বলে প্রায় দুশোর কাছাকাছি। একশ পঁচাশিটা।

রমেশ – হিসস্, আস্তে আস্তে, (একটা শব্দ শোনা যাবে) ছপ ছপ শব্দ হচ্ছে শুনতে পাচ্ছ? ওই যে নালার পাশে গত্ত আসলো। ওখানে ইসপিড খরগোস থাকে।

ঐশিকা – কী থাকে?

রুপম – (ফিস্ ফিস্ কোরে) হিসপিড হেয়ার। এক বিরল প্রজাতির খরগোস। বিরল প্রজাতি মানে?

ঐশিকা – যাদের বেশি পাওয়া যায় না। তাই খুব কম দেখা যায়।

অয়ন – বাবা নাকি এক-দুবার দেখেছে। নিশ্চয় আমাদের শব্দ পেয়ে গর্তে ঢুকে গেছে। রমেশকাকু মাহুতকে বল ডানদিকের শিমূল গাছটার কাছে আস্তে আস্তে যেতে। টিয়াগুলো আছে মনে হয়।

(টিয়াপাখির কলরব আস্তে আস্তে বাড়বে)

ঐশিকা – ওরে বাবা এত টিয়া! গোটা গাছটাকেই ঢেকে ফেলেছে!

রমেশ – হ্যাঁগো দিদি, এই পক্ষী শিমূলের ফুল, ফল খেতে আসে। বাবু পাশের শাল গাছের মাথায়, হুই উঁচু ডালে আসছে কিনা দেখেন তো। দূরবীন লাগান।

রুপম – দেখছি তো টিয়াতে শাল গাছ ছেয়েও – না,না, একমিনিট – এক জোড়া ধনেশ পাখি যেন রমেশ –

রমেশ – ধনেশই বটে। আমার খালি চক্ষুতে লাগছিল যে –

ঐশিকা – ধনেশ? হর্ন বিল? দেখি দেখি। সত্যি তো! এতদিন শুধু ছবি দেখেছি। আজ জ্যান্ত পাখি দেখলাম অয়নদা!

অয়ন – সকালে মা বলল না প্রায় আড়াইশ মতো প্রজাতির পাখি আছে এখানে। মা নিজেই ক্যাটালগ করেছে দেড়শ মতো? আনকমন্ কয়েকটা নাম তো মা-ই বলল।

রমেশ – খোকাদাদা, এবার আমাদের ফিরতে হবে। সাহেব বেরুবেন।

রুপম – আমাকেও বলে দিয়েছে সুব্রত। এখান থেকেই ফিরতে বলল। গাড়ি – সরি – হাতি ঘোরাও রমেশ।

(একটু মিলিত হাসির মধ্যে দৃশ্যান্তর)

সপ্তম দৃশ্য

(বিকেলবেলা। সুব্রতর বাংলোর ড্রয়িংরুম।)

সুব্রত – তারপর, কেমন লাগছে জঙ্গল?

কণিকা – (কৃত্রিম রোষে) নিজে পড়ে আছে নিজের অফিস নিয়ে, আবার জিজ্ঞাসা করছে, কেমন লাগছে জঙ্গল?

রূপম – আরে না না, কোথায় পড়ে আছে? নিজে যে ভোরবেলা নিয়ে গেল, হাতির পিঠে ঘোরানোর ব্যবস্থা করল?

অয়ন – বাবা আজো তোমার হিস্পিড হেয়ার দেখতে পেলাম না।

সুব্রত – কেন সেবার মুম্বাই ন্যাচুরাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম থেকে পাঁচ দিন গাছের মাচাতে বসে মাত্র একদিন দেখা পেয়ে ছবি তুলতে পারল না? আমিই তো এতদিনে মাত্র দুবার দেখা পেয়েছি।

মণিদীপা – জায়গাটা সত্যিই সুন্দর। বারান্দায় বসে থাকলেই মন ভরে যায়।

অয়ন – কাকিমা একদিন-দুদিন ভালো লাগে। দিনের পর দিন থাকতে হলে বুঝতে। একবার বর্ষাকালে এসো।

রূপম – তা ঠিক। জঙ্গল দেখতে যতই ভালো লাগুক, বসবাসের জন্য নয়। তাহলে মানুষ জঙ্গল ছেড়ে গ্রাম শহর তৈরি করত না।

সুব্রত – আচ্ছা ঐশী এই জঙ্গলটা কেটে একটা সুন্দর শহর বানালে কেমন হয়?

ঐশিকা – জঙ্গলটা কেটে ফেললে এই এত পশুপাখি পোকামাকড় এরা সব কোথায় যাবে?

সুব্রত – সে না-হয় এদের সবাইকে একটা মস্ত বড় চিড়িয়াখানা বানিয়ে তাতে রেখে দেব!

ঐশিকা – আর গাছ। গাছ না থাকলে ওরা থাকবে কোথায়? খাবেই বা কি।

(কখন বুধন এসে দাঁড়িয়েছে)

বুধন – আর, আমার বাপের ইনকাম কমে যাবে।

(সবাই হেসে উঠবে)

কণিকা – ঠিক, একেবারে ঠিক।

সুব্রত – সত্যি ওটাও সার্ভিস প্রকৃতির।

অয়ন – বাবা তুমি মজা করছ? আমি জানি গাছ থেকে আমরা কত সার্ভিস পাই। খাবার, ওষুধ, অক্সিজেন, জ্বালানি – কত কী।

ঐশিকা – জঙ্গল না থাকলে তো বৃষ্টিও থাকবে না। আর বৃষ্টি নেই মানে সব মরুভূমি। ঘাস, লতাপাতা এরা মাটির জল ধরে রাখবার ক্ষমতা বাড়ায়।

রূপম – তোরা একটা কথা কেউ বলছিস না কেন? এই যে সবাই মিলে কারবন-ডাই-অক্সাইড ছাড়ছি। এ শুষে নিচ্ছে গাছপালা। কনভার্ট করে বাতাসে ছেড়ে দিচ্ছে অক্সিজেন। এই প্রসেসটা না থাকলে আমরা এখানে আজ বসে থাকতে পারতাম?

অয়ন – তার মানে একটা সাইক্লিক প্রসেস কাকু। তাই না।

সুব্রত – তাহলে এটা দাঁড়াল জঙ্গল কাটা ঠিক হবে না?

অয়ন ও ঐশিকা – একেবারেই না। মোটেও ঠিক হবে না।

কণিকা – রূপমদা এবার একটু কফি?

রূপম – অহো! গভীর বনোমধ্যে একী প্রশ্ন কপালকুন্ডলে!

মণিদীপা – কনিদি, হেডমাস্টার বাবুর কবিত্বের ধামা খুলেছে জঙ্গলে এসে!

(সবাই হেসে উঠবে)

কণিকা – (হেসে বলবে) আমি আসছি।

মণিদীপা – (হেসে বলবে) বিজ্ঞান ও কবিতা চলুক। আমিও যাচ্ছি কনিদির সাথে।

(কণিকা ও মণিদীপা কিচেনে গেল)

সুব্রত – (একটু গভীর কণ্ঠে) কনি তোরা আসাতে খুব খুসি। ওর সেই একা একা ভাবটা চোখে পড়ার মতো কেটেছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। একটা গাছ কি দিয়ে তৈরি?

অয়ন – কেন কার্বন, সাথে ওটু আর এইচটু, মানে কারবোহাইড্রেইট। ঠিক বললাম বাবা?

সুব্রত – বেশ, তাহলে এক একটা গাছ আসলে কার্বনের স্তম্ভ, পিলার, তাহলে কি ভুল বলা হবে?

রূপম – আজকাল কার্বন সিকোয়েস্ট্রেশন (sequestration) নিয়ে খুব আলোচনা হচ্ছে। ওই প্রসঙ্গেই কার্বন স্তম্ভ।

সুব্রত – অয়নচন্দ্র, ফোটোসিন্থেসিসে বাতাসের বা জলের কার্বন শর্করায় বাঁধা পরে তো?

রূপম – কার্বন সিকোয়েস্ট্রেশন হোল বাতাসের কার্বন বেঁধে রাখা। বাঁধতে পারলে বাতাসের কার্বন কমে যাবে।

সুব্রত – আর কমে গেলে?

অয়ন ও ঐশিকা – (একসাথে) বাতাসে পলিউশনের মাত্রা কমবে।

রূপম – ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা কমবে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর একটা বড় কারণ কারবন-ডাই-অক্সাইড। ওটা কমাবার একটা বড় হাতিয়ার হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বৃক্ষ, মানে অরণ্য বা অরণ্য বাস্তুতন্ত্র। কি ক্লিয়ার?

(কণিকা ও মণিদীপা কিচেন থেকে। সাথে ট্রে হাতে বুধন।)

কণিকা – এখন একটা কমার্শিয়াল ব্রেক। আমাদের কফি। অয়ন আর ঐশিকার জন্য স্যুপ। বুধন গোলমরিচের –

বুধন – আমার পকেটে গোলমরিচ-এর আর সল্ট পট মেমসাব।

(সবাই হো হো করে হেসে উঠবে।)

মণিদীপা – (কফি খেতে খেতে) আচ্ছা সুব্রতদা আপনার এখানে তো চার বছর হয়ে গেল? এবার বদলি হবেন না?

সুব্রত – সে ভাই কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম।

রূপম – তা কর্তার ইচ্ছেটা কি? রেখে দেওয়া?

কণিকা – একথা কেন বলছেন রূপমদা?

রূপম – অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। খুব সেনসিটিভ জায়গাতে যারা ভালো কাজ করে সরকার তাদের সরাতে চায় না।

কণিকা – তাই? কর্মঠ অফিসার হিসেবে আপনার বন্ধুর নাম আছে তা আমি জানি। অয়ন সামনের বছর মাধ্যমিক দেবে। ওকে হস্টেলে রেখে অনেক বছর পড়াচ্ছি আমরা। একই ভাবে চললে আমাদের অসুবিধে নেই।

রূপম – অয়ন এরপর কি নিয়ে পড়াশোনা করতে চায়?

অয়ন – আমার ইচ্ছে কাকু এনভিরনমেন্ট সায়েন্স নিয়ে।

রূপম – কেন ডাক্তার হতে, এঞ্জিনিয়র হতে চাও না?

অয়ন – না কাকু, আমাদের স্কুলের কাউন্সেলারের সাথে আমি, বাবা, মা আলাদা আলাদা কথা বলেই ডিসিশন নিয়েছি।

রূপম – অবাক অবশ্যই হলাম, তবে খুব ভালো লাগলো তুমি পরিবেশ বিজ্ঞান নিয়ে পড়বে এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছ। সবাই তো দেখি হয় ডাক্তারী, নয় এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পেলে বর্তে যায়।

মণিদীপা – (কফি খেতে খেতে) এখন আর পড়াশোনা নয়। এখন একটা গান হবে। ডুয়েট। শিল্পী কনি আর সুব্রতদা।

রূপম – আরে ঠিক তো, সুব্রত তুই তো ভালই গান গাইতি! তো বউও জোগাড় করেছিস গাইয়ে! সাবাস বেটা।

সুব্রত – সে ভাই তুমিও তো জুলজির বাইরে হাঁটলে না!

রূপম – তা অবশ্য ঠিক। নে এখন গান হোক।

(আগে কনিকা, পড়ে সুব্রত ধরবে ' আকাশ ভরা সূর্য তারা-'। এক লাইনের পর গান মিলিয়ে গিয়ে দৃশ্যান্তর)

অষ্টম দৃশ্য

(খুব ভোরবেলা। সুব্রতর বাংলোর একতলাতে অফিসের সামনের বারান্দা।)

সুব্রত – দেখতে দেখতে পাঁচ পাঁচটা দিনে চলে গেল। বুঝতেই পারলাম না রে।

রূপম – হ্যাঁরে, বুঝতেই পারলাম না রে। আবার সেই কোলকাতার জনারণ্যের জীবন।

সুব্রত – এই দিক থেকে আমরা আনন্দে। এখানে নতুন কিছু একটা যেন হবেই। সে ভালো হতে পারে, আবার খারাপও।

রূপম – বর্ষার সময় ছাড়া অবশ্য ভালই কাটাস তোরা।

সুব্রত – একটা কারণ অবশ্যই খুব ডেডিকেটেড স্টাফ। প্রত্যেকটি বীট অফিসার ইয়াং, সৎ। চেক পোস্টগুলো ধীরে ধীরে কন্ট্রোলে এসেছে।

রূপম – জঙ্গল পাহারা দেওয়া ছাড়া তোদের পড়াশুনোটা চালিয়ে যাওয়াটাও ইন্টারেস্টিং।

সুব্রত – এই চাকরি আমার বাই চয়েস নয়, তুই জানিস। জাস্ট রোজগারের, সংসার প্রতিপালনের রাস্তা। তবে এতদিন পরে, বলতে বাধা নেই, এই জঙ্গল আমি ভালোবাসি রূপম। তার কারণ দুটো।

রূপম – শুনি কারণ দুটো।

সুব্রত – খুব আস্তে আস্তে, অনেক বছর পরে, আমি বোধ হয় এখন জানি, কী বিপুল উপকার এই জঙ্গলের মাটি, জল, প্রতিটি ছোটবড় গাছ, প্রতিটি প্রানী আমাকে দুহাত ভরে দেয়। আমি কবিত্ব করছি না। আই এডমিট সলেমলি।

রূপম – আমি তোর সাথে একমত সুব্রত। একসময় আমিও তো এই অঞ্চলে চাকরি করেছি। জঙ্গলে যাওয়াআসা আমারও ছিল। সে সময় আমারও কি রকম নেশা ধরে যেত জঙ্গলে এলে। সে যাক, তোর দ্বিতীয় কারণ?

সুব্রত – কণিকা, কনি, আমার স্ত্রী। পুরো আরবান ব্যাকগ্রাউন্ড। গাছ বলতে বাড়ির তুলসী গাছ ছাড়া মনে হয় আর কিছু দেখেনি। দুই দিদির পুরো মেমসাহেবের জীবন, দুই জামাইবাবুর জীবন মানে দিনান্তে ক্লাব আর রেসের মাঠ। আমাকে হাতি, গণ্ডারের সমগোত্র ভাবেন। তোকে বোর করছিনা তো?

রূপম – স্পিক আউট সুব্রত। স্পিক আউট।

সুব্রত – খুব লড়াই করেছে কনি। মানুষের সাথে। নিজের সাথে। আমি সাথে ছিলাম এই পর্যন্ত। ওকে দুই হাত দিয়ে আগলে রেখেছে এই জঙ্গল। আমি বিশ্বাস করি রূপম। এই যে অসীম নিস্তব্ধতা, প্রতিটি নির্জীব বা জীবন্ত বস্তু প্রত্যেকে যেন প্রত্যেককে প্রটেক্ট করছে। আবার নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দিচ্ছে, এইটে মনে হয় কনিকাকে কনি হতে সাহায্য করেছে। এখনো করছে। ভবিষ্যতেও করবে। একটা গান শুনবি। (অপেক্ষা না করে) 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, এই আকাশে, আমার মুক্তি ধুলায় ধূলায় সর্বজনের মনের মাঝে, দুঃখ বিপদ তুচ্ছ করা কঠিন কাজে'।

(গানের মধ্যেই দৃশ্যান্তর)

(একই দিন খুব ভোরবেলা। সুব্রতর দোতলা বাংলো কোয়ার্টারের পিছনের বারান্দা।)

কণিকা – দেখতে দেখতে পাঁচ পাঁচটা দিনে চলে গেল। বুঝতেই পারলাম না।

মণিদীপা - ঠিক কনিদি, বুঝতেই পারলাম না। আবার সেই কোলকাতার জনারণ্যের জীবন। দুই প্রান্তে দুজনের স্কুল। দিনের শেষে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরা।

কণিকা – এদিক থেকে আমরা আনন্দে। ওর অফিস একতলাতে। কিচেন গার্ডেনে কাজ করতে করতে অফিসের জানালা দিয়ে লেটুস পাতা দেখাই। আমি হাসি। ও হাসে।

মণিদীপা – বর্ষার সময় দিনের পর দিন বৃষ্টি, মেঘলা আকাশ। খারাপ লাগে না?

কণিকা – প্রথম প্রথম লাগতো। এখন ওরকম হবে জানি, তাই সয়ে গেছে। তাছাড়া, কী সবুজ, কী সবুজ সে সময়!

মণিদীপা – তোমার বার্ড ওয়াচিং হবিটা ইন্টারেস্টিং। খুব ভালো কাজ। ওটাকে কিন্তু কনিদি ছাড়বেনা।

কণিকা – একটা কথা তোমাকে বলব? কিছু মনে করবে না বল?

মণিদীপা – ওমা, মনে করব কেন? বল।

কণিকা – মনিদি এই বিয়ে আমার বাই চয়েস নয়। বাবা-মা ঠিক করলেন। বললেন, পাত্রটি ভালো। আমিও ভাবলাম পাত্রটি ভালো। বলতে বাধা নেই, এই জঙ্গল আমি ভালোবাসি মনিদি। তার কারণ দুটো।

মণিদীপা – দুটো কারণ। শুনি।

কণিকা – খুব আস্তে আস্তে, অনেক বছর পরে, আমি বোধ হয় এখন জানি, কী বিপুল উপকার এই জঙ্গলের মাটি, জল, প্রতিটি ছোটবড় গাছ, প্রতিটি প্রানী আমার জন্য করে।

মণিদীপা – আমি সেটা বুঝি কনি। তোমার দ্বিতীয় কারণ?

কণিকা – আমি শহুরে মেয়ে মনিদি। পুরো আরবান ব্যাকগ্রাউন্ড। গাছ বলতে আমাদের বাড়ির একটা মাধবীলতা ছাড়া মনে হয় আর কিছু মন দিয়ে দেখিনি। আমার দুই দিদি পুরো মেমসাহেব। দুই জামাইবাবু সাহেব। বাবার কাছে পাত্রের পরিচয় শুনে ভেবেছিলেন আমাকে বিয়ের পর হয় বাঘে খাবে, কিম্বা সাপে কাটবে। আপনার সকালটা মাটি করে দিচ্ছি নাতো?

মণিদীপা – এমা, না। না, না।

কণিকা – খুব লড়াই করেছি আমি। আত্মীয়স্বজনের সাথে। নিজের সাথে। ও সাথে ছিল সেই লড়াইতে। আমি জানি ও আমাকে দু'হাত দিয়ে আগলে রেখেছে এই জঙ্গলে। এই বিশাল জঙ্গলের অসীম নিস্তব্ধতা, জঙ্গলের নিজেকে আমার কাছে অকাতরে বিলিয়ে দেওয়া, এইটে আমাকে সাহায্য করেছে। ভেবে দেখলে আমার মনের প্রশান্তি পেয়েছি এই জঙ্গলের কাছেই। এখনো পাই। তোর্ষার ওপারে সূর্য উঠছে মনিদি।

ওঁ জবাকুসুমসংকাশং কাশ্যপ্রিয়া মহাদ্যুতিম, ধান্তারিং সর্বপাপঘ্ন, প্রণতোহস্মি দিবাকরম।

(আবহসঙ্গীত)

সমাপ্ত